Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 136-140
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বঙ্কিম উপন্যাসের মানস সমুদ্রে বৈষ্ণবীয় বারিধারা

শ্যামসুন্দর রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

Abstract

Bankim Chandra made a clear estrangement from vaidik ideas by explaining Bhaktism which, even Mahaprabhu himself preached through Ramananda. Again, Lord Sri Krishna who has been the almighty god to vaishnava, is a mere human being to Bankim Chandra. In that argument he has placed Sri Krishna higher than Lord Gautam Buddha and Zesus Christ. He has firmly claimed that Sri Krishna should worshipped as a complete human being. According to Bankim Chandra, this worship to god is like love to human beings. Bankim, through his novels and essays has tried to re-established Sri Krishna as a pure complete human being. In the era of nineteenth century when many used to ridicule Sri Krishna and Sri Chaitanya; and also their vaishnava religion and philosophy, and it was Bankim Chandra rediscovered their honour and their place through his writing. It was Bankim chandra who, for the first time attracted the attention of the educated bengalis intelligentsia to the Sri Chaitanya's idea and movement.

Keyword: Mathura, Yamuna, Shyam, Chaitanya, Gadadhar.

‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্রের ঋষি শ্রেষ্ঠতম উপ্যনাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। বাংলাভাষা পুষ্টিসাধনে এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্র নিয়ন্ত্রনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান কতখানি তা ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় সাহিত্য স্রষ্টা উপন্যাসিক রুপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুর দশ বারো বছরের মধ্যেই জাতীয়তার উদ্গাতা রূপে সমধিক পূজিত হয়েছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও সমষ্টি গত ভাবে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ে তাঁর বহুগুন কর্তৃক লিখিত নানা কথা উপন্যাস গ্রন্থাদির উপর বিশেষ আলোকপাত করেই আলোচ্য বিষয় বঙ্কিম উপন্যাসে বৈষ্ণব ভাবনা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন তাঁর তরুণ অবস্থা থেকে মনে এই প্রশ্ন উদিত হত “এ জীবন নিয়ে কি করিব, লইয়া কি করিতে হয়। সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুজিয়াছিফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য জন্ম নাই।”(১) এই ভক্তিবাদকেই মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই বৈদিক ক্রিয়া কর্ম ও ঔপনিষদিক ধ্যান ধর্মের যে অনুষ্ঠান ও তত্ত্বমুখিতা তা থেকে সরে এলেনঃ বেদ সম্পর্কে বঙ্কিম বললেন বেদে যখন ভক্তি নেই, তখন বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট। বেদ সম্পর্কে বঙ্কিমের এই উক্তির তাৎপর্য

হল, বেদে কাম্যবস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির নানা নির্দেশ আছে, দেবতাদের প্রসন্ন করার নানা প্রয়াস আছে, কিন্তু যে পরিপূর্ণতাকে দেখে নিজেকে তৈরী করব, সে পরিপূর্ণতার স্পষ্ট চিত্রটি সেখানে সামনে নেই। তাই ঋগ্বেদের সেই সুন্দর সূর্য প্রার্থনাটি, যেখানে ঋষি বলেছেন, হে পূষন যদি জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নে, কিছুমাত্র পাপের চিন্তা করে থাকি তবে তার অনুশোচনায় কালরাত্রি যেন দীর্ঘ না হয়, সেই প্রার্থনাটির কথা বঙ্কিম একটু লঘুভাবেই তাঁর ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় উল্লেখ করে গেছেন। উপনিষদে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানমার্গ থেকে সরে এসেছেন, রায় রামানন্দ মিলনে মহাপ্রভু জ্ঞানমার্গকে নিতান্ত বাইরের এটি জ্ঞান করে রামানন্দকে বলেছেন– 'এহবাহ্য আগে কহ আর' আবার বঙ্কিমচন্দ্র ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্লোকটিতে আত্মরতির কথা বলা হয়েছে, সেই শ্লোকটি গ্রহন করেছেন। সেখানে আছে 'আত্মায় যাহার আনন্দ সে স্বরাজ হয়।[আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজনন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স্বরাড় ভবতি] তাঁর মতে মানুসের এমন চিত্তবৃত্তি নেই, যা দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হলে হতে পারেন কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝতে পারিনা, কেননা আমাদের সে শক্তি নেই। বৈষ্ণবদের কাছে শ্রী কৃষ্ণ যেমন 'অনাদির আদি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' বঙ্কিমের কাছে তিনি আদর্শ পুরুষ এবং আদর্শ গৃহী।

অনুশীলন তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরনের উপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহন করেছেন; আর এই কৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর এক ধারনা ছোটবেলা থেকেই হৃদয়ে গ্রথিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন 'শ্রী কৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র হলধরের এই কয়টি কথা শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছিল।' তাঁর মতে যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী- আদরসপুরুষ নয়।

এই আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করে বঙ্কিম মহাত্মা যীশু, প্রভুবুদ্ধ ও ভগবান শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে মনে মনে একরূপ কলহ করেছেন। তৎকালীন মিশনারী পাদ্রীদের এবং ইংরাজি শিক্ষাভিমানী এবং বঙ্গীয়দের উৎপাতে বঙ্কিমচন্দ্র যেন বর্ম পরে সেই আদর্শের অর্থাৎ কৃষ্ণ চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় নেমে ছিলেন। তাই কথার মধ্যে হিন্দুয়ানির ঝাঁঝটা যেমন একটু বেশি তেমনি খ্রিস্টান প্রতি বিদ্রুপ এবং মহাত্মা যীশুর প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। মানব চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। এ জ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়। ধর্মজ্ঞান হলে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক যীশুর সেই জ্ঞান ছিল। যদি ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞানের শেষ কথা হয়, যে জানে ,' যদ্দিন সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভুদ বিজানতঃ ৎত্র কচমোহঃ কঃ শোক একত্বমপু পশ্যত' – তবে যীশু শাক্যসিংহ এই মহাত্মারা জ্ঞানের উচ্চশিখরে উপনীত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ভাগ্যে বহির্বিজ্ঞানের ও অন্তর্বিজ্ঞান এই দুই জ্ঞানের কথা বলেছেন। বহির্বিজ্ঞানের কোমতের নির্দিষ্ট Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology, Sociology এই ছয়শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন। অন্তর্বিজ্ঞান বলতে হিন্দুদর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। পরিপূর্ণ এই জ্ঞানের ধারনাতেই বঙ্কিমকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছে যীশু অশিক্ষিত।

বৈষ্ণবদের রাসলীলার তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাঁর আরাধনাই স্ত্রী জাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা থেকে রাসের অর্থগ্রহন করেছেন- স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের হাত ধরে গাইতে গাইতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করতে করতে যে নিত্য করে তার নাম রাস। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়– 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি/ নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।' বঙ্কিমচন্দ্র তাই

নির্দোষ আদিরসের নামগন্ধহীন খেলা বলেই মনে করেছেন। ভাগবতের শ্রী কৃষ্ণ ব্যাক্তিমানব নন, তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন নন, এই অর্থে তিনি জিতেন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় তাই তাঁর জিতেন্দ্রিয়তার কারন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ পরিপূর্ণমানব বলেই ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, এই অর্থে তিনি জিতেন্দ্রিয়, শ্রী কৃষ্ণকে যদি অশরীরী বলে দেখি তবে রাসলীলা মাত্রেই উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতা। তিনি এ কথা বললেন না যে শ্রী কৃষ্ণ কে ঈশ্বর রূপেই পুজা কর, তিনি বললেন শ্রী কৃষ্ণ কে পরিপূর্ণ মানব জেনেই ভক্তি কর। পরিপূর্ণতার ভুমিকায় ভক্তির তিনি তাই নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন যে চিত্তবৃত্তিকে আমরা পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করি, তারই নাম ভক্তি। পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করার অর্থ তাকে জীবনে একান্ত জেনে আচরণ করা।ভক্তি তাই বিশ্ব স্বরূপে ধ্যানমূলক আর আচরণে ক্রিয়ামুলক। ধ্যানে, জ্ঞানে এবং কর্মে পরিপূর্ণতার প্রতি চিত্তের অভিমুখতাই হল ভক্তি। ভক্তি অর্থে প্রতি মুহূর্তের চরিত্র প্রস্তুতি। ভক্তি তাই এক অভিনব জীবন ব্রতে দীক্ষা, ভক্তি অন্তর সাধনা। শ্রী কৃষ্ণের বানীতে যে চিত্তসাধনার কথা আছে, বঙ্কিম তাকেই পরিপূর্ণতার সাধনা বা ভক্তি বলে নির্দেশ করেছেন – "যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযম, যে সমদর্শী, যে পরহিতে ব্রতী সেই ভক্ত। ইশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, তাহার চরিত্র ইশ্বরানুরাগী নহে, সে ভক্ত নহে, যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে সে ভক্ত নহে,জাহার সকল চিত্তরতি ঈশ্বরমুখি না হইয়াছে সে ভক্ত নহে।"(২) ভক্তি অর্থে তাই চ্রিত্র সাধনা। ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্মে জখন পরিপূর্ণতাই আমাদের লক্ষ্য তখনই আমরা সাধক ভক্ত। সর্বসঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্যে অন্তরে বাহিরে সাধনাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্বীকার করে চলাই হল, বঙ্কিমের মতে ধর্মচেতনা।

ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য। যখন সকল বৃত্তিগুলিই ইশ্বরানুবর্তিনী হই,সেই অবস্থাই ভক্তি।ব্যক্তিতে যা প্রেম তাই শেষ নয়, প্রেম হল সোপান। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, ব্যক্তি থেকে ইশ্বরে, প্রেম থেকে ভক্তিতে অভিযাত্রা।

বঙ্কিমের সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসের বৈষ্ণবীয় চিত্র এবং বৈষ্ণবীয় চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত। পরবর্তীকালে কবি ঔপন্যাসিক, পাঠক ও সমালোচক সকলেই বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের রোম্যান্টিক মাধুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব কবিতায় রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে মানবজীবনের চিরন্তন মূর্ছনাকে শুনেছিলেন। সেই কারনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাববেদনাকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যা বাংলা সাহিত্যে নব যুগের সূচনা করেছিল। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে পঞ্চাদশ পরিচ্ছদে দিগগজের গাওয়া গানে বৈষ্ণবের প্রভাব—

"এ হুম উ হুম
এই কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে কদম্বেরি ডালে
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর কালি দিলাম কুলে
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশি, কথা কয় হাসি হাসি
বলে ও গোয়ালমাসি কলসী দেব ফেলে।"(৩)

দর্শনজনিত পূর্বরাগের এই পদটি সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন—

“দেইখ্যা আইলাম তারে
সই দেইখ্যা আইলাম তারে
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।”

দিগগজের গাওয়া এই পদের মধ্যে দেখি রাধারানী দু চোখ ভরে দেখেছেন শ্যামরূপ। দেখে উচ্চারন করেছেন সেই প্রসিদ্ধ উক্তি এক অঙ্গে এতরূপ কখনো ধরে না।এ শুধু রূপাবিষ্টার সাধারন স্বীকৃতি নয় – গভীর প্রেমের প্রেরণা রয়েছে এ উচ্চারনের পিছনে। বিনদ চূড়ার উপরে ময়ূর পাখা, চন্দন চর্চিত স্নিগ্ধ তুনু স্মৃতিতে যখনই জেগে উঠেছে তখনই মনে হয় জাতি কূল শীল আর আর রাখা গেল না। গৃহে কর্মে মন বসে না সেই প্রেমের ঘোর রাধার সারা চেতনায়।

প্রেমই সেই কান্ডারী প্রেমই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। পথ দেখায় মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে অন্ধকার থেকে আলোয় তরী হতে তীরে। বঙ্কিমসাহিত্য বেদনায় অশ্রুতে তাই সাধনার পথ নির্দেশ। আবার ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে তৃতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদের শুরুতেই ‘উদ্ধবদূতের’ শ্লোক ‘শ্যামাদণ্যে নাহি নাহি প্রাণনাথ মমস্তি’ লিখেছেন, তারপর সরাসরি প্রবেশ করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীতে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শুরুতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের “জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন পা তিরপিত ভেল।” বঙ্কিমের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত এই পদটিতে পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য সম্ভোগে অতৃপ্তি ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই পদ যোজনায় বঙ্কিমের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালীর প্রাচীন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক পাঠক সমাজের পরিচয় ঘটানো।

“মৃণালিনী” উপন্যাসে প্রনয়দুতী গিরিজায়া একাধিক বৈষ্ণব গান গেয়েছেন। তার ব্রজবুলি পদটি ব্যঞ্জনাধর্মী “মথুরা বাসিনি মধুর হাসিনি, শ্যাম বিলাসিনি রে”। ‘মাথুর’ পদটির এখানে তাৎপর্য, মৃণালিনীর প্রণয় লাভের আশায় হেমেন্দ্রর গৃহত্যাগ আবার গিরিজায়ার কন্ঠে শুনি আত্মনিবেদনের পদ– “চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরান রতন।“ এই পদ্গুলি বৈষ্ণব কবিদের কোন কোন ছত্র স্মরন করায়। আমাদের যেন সেই প্রেম বৃন্দাবনে নিয়ে যায়। শ্রী রাধিকা কৃষ্ণের প্রেম সমুদ্রের মাঝে ডুব দিয়েছে। ভেসে গেছে তার কুল শীল লাজ। উভয়ের ভালবাসা উভয়ের হৃদয়ের উত্তাপে এমনি করে হয়েছে গভির,সেই গভীর প্রেম উভয়ের দিক থেকেই ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় আত্মনিবদনের শান্ত উপকূলে। নরনারীর প্রনয়ভাব প্রকাশের অন্যতম উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে বৈষ্ণব গীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে শিল্প সম্মতরূপে ব্যবহার করেছেন।

‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বৈষ্ণব একটি চরিত্রই আছে ‘হরিদাসী বৈষ্ণবী’ বলে। বৈষ্ণবতত্ত্বের পরকীয়া প্রণয় ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে হরিদাসী বৈষ্ণববেশী দেবেন্দ্রর গানের মধ্য দিয়ে। হরিদাসী কুন্দ নন্দিনীর মুখপানে চেয়ে গেয়ে ওঠে- শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে/ তাই এসেছি গোকুলে।“ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ কৃষ্ণকান্তকে মৃত্যুর সময় বলতে শুনি “ঔষধের অপেক্ষা হরিনাম আমার উপকার। তম্রা হরিনাম ক্র। আমি শুনি।“(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস ‘সীতারাম’ এ দেখি সন্ন্যাসী শঙ্খ চক্র গদাধর পীতাম্বর কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে–

“জয় শিব শঙ্কর ! ত্রিপুর নিধন কর!
রণে ভয়ঙ্কর ! জয় জয় রে!
চল গদাধর! কৃষ্ণ পীতাম্বর!
জয় জয় হরি হর! জয় জয় রে!”(৫)

কৃষ্ণ ও শ্রী চৈতন্যকে উপহাস করে বাংলার ধর্মদর্শনকে যখন রামমোহন নস্যাৎ করতে ছান, বঙ্কিমচন্দ্র তখন শ্রী কৃষ্ণ ও গৌর সুন্দরের নব মূল্যায়ন করে বঙ্গভূমিতে তাঁদের শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসান। বিস্ময়ের কথা হল ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে চৈতন্য ভাবান্দোলনের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি, সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই আকর্ষণ করে বলেছেন- "আজ পেত্রার্ক, কাল হুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকণ, ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছাস হইল। আমাদিগের ও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধম্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরমনি,গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপর গামিগন আবার বাংলা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পর চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাংলা কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী জগতে অতুলনীয়া, সে কথা হইতে?"(৬) সেই উত্তরে আলছনার ইতি তানি সরোজিনী নাইডুর এক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে- "শ্রী চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমধর্মই যুগধর্ম। শ্রী চৈতন্য শুধু বাঙালীর জন্য নহেন, তিনি সর্ব জগতের পুজ্য। শ্রী গৌরাঙ্গের ধর্ম যাজনা করুন - সর্ব অনর্থের নাশ হইবে।"(৭)

তথ্যসূত্র :

১) বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ - হরপ্রসাদ মিত্র- প্রথম প্রকাশ মহলয়া ১৩৭০ বি. সরকার এ্যান্ড কোং, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫।

২) বঙ্কিম প্রসঙ্গ - সুরেশ্চন্দ্র সমাজপতি, মূখার্জি বসে কোং, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২২।

৩) বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা।

৪) বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১১।

৫) বঙ্কিমচন্দ্ররচনাবলী (প্রথম খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৬৩, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯।

৬) বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬।

৭) অনিকেত পত্রিকা, বিবেক ঘোষাল, বীরভূম, সিউড়ি, প্রকাশ ২০১৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা ।